পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলেই মানুষ সেরা হতে পারে। যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে যেসব নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। এমনিভাবে যেসব মনীষী, নবি ও রাসুলগণের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো আমাদের আদর্শ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- আদর্শ জীবনচরিত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), ও হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন– সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনের উপায় বলতে পারব।
- দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উপায় এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

হযরত ইসমাঈল (আ.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তিনি হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাতার নাম হাজিরা (আ.)। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি কুরাইশ ও উত্তর আরবের 'আদনান' বংশের আদি পিতা।

মক্কায় স্থানান্তর ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য এ বলে দোয়া করেন- "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। 'হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাঁদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিযিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)

অল্প কিছুদিন পর তাঁদের খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাঈল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তার চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে আল্লাহর হুকুমে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জমজম কূপের উৎস। হযরত হাজিরা (আ.) ঐ কূপ থেকে নিজে পানি পান করেন এবং তাঁর শিশু পুত্রকেও তা পান করান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এ কূপকে কেন্দ্র করে জুরহুম গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। এ গোত্রে হযরত ইসমাঈল (আ.) বিবাহ করেন। কুরাইশ গোত্র এ গোত্রের একটি শাখা।

কুরবানি

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি পরীক্ষা। একদা হযরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া থেকে বিবি হাজিরা ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে মক্কায় গমন করেন। তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। জাগ্রত হয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বলেন, 'হে পুত্র! স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। তুমি কী বলো?' তখন পুত্র ইসমাঈল কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে আনন্দ চিত্তে উত্তরে বলেন, "হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।"
(সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে 'মিনা'র পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইসমাঈল (আ)-কে বারবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে নির্বিঘ্নে মিনায় পৌছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) আওয়াজ শুনতে পেলেন, "হে ইবরাহিম! তুমিতো তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০৫)। অলৌকিকভাবে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাঈল (আ.) দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এ পশু কুরবানি। কুরবানি করা ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

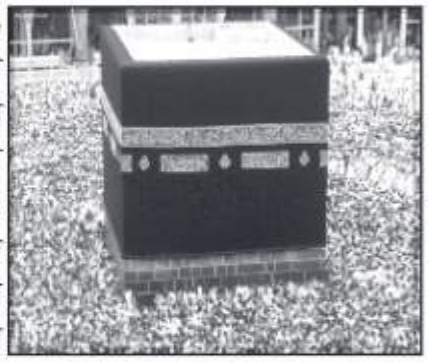

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে তারই প্রদর্শিত স্থানে প্রথম কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "স্মরণ কর! যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবাঘরের প্রাচীর তুলে ছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)। হযরত ইবরাহিম (আ.) পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর তুলে দিতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-পুত্র কাবাঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।

উপাধি লাভ

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ধৈর্যশীল ও পিতাভক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'ছাদেকুল ওয়াদ' (অঙ্গীকার পালনকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার করেছেন: অমুক স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করবেন, লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে সেখানে দেখা হয়। (ইবনু কাছির)

নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ ছাদেকুল ওয়াদ বা অঙ্গীকার পালনকারী উপাধি দান করেছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত ইসমাঈল (আ.) একশত ছত্রিশ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, পিতৃভক্তি, ত্যাগ, অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানির কাহিনী ও জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ২
হযরত ইউসুফ (আ.)

পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহিলা বিন্‌তে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯২৭-১৮১৭-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী। শারীরিক গঠনে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। আর ব্যবহারে বিনয়ী ও উত্তম চরিত্র গুণে গুণান্বিত। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম কাহিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের কবলে হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অনেক আদর করতেন। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তারা তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে একদিন তারা তাঁকে খেলার কথা বলে নির্জন একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে মারধর করে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা পিতাকে বলে, আমরা যখন খেলাধুলা করছিলাম তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। দেখুন এই যে তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড়। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বরং মর্মাহত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করে বললেন, "ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৮)

ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয়

একটি বণিকদল ঐ কূপের পাশ দিয়ে মিসরে যাচ্ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় দলটি কূপের ধারে এসে থামল। তাঁরা পানির জন্য কূপের ভিতরে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) বালতির রশি ধরে উপরে উঠে আসেন। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, "কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৯)

তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে। মিসরের শাসক আজিজ তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (মুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতে থাকেন। হযরত ইউসুফ(আ.) যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দায়ে কারাবরণ করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দরুণ ক্রমান্বয়ে কারাগারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

একদিন মিসরের বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন, 'সাতটি সুস্থ-সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখেন সাতটি সবুজ শস্য শিষ এবং সাতটি শুষ্ক শিষ।' তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের ডাকেন। কিন্তু কারোর ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ হয়নি। বাদশাহ খবর পেলেন কারাগারে এক যুবক আছেন, যিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশেষে বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট এ স্বপ্নের

ব্যাখ্যা জানতে চান। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, 'দেশে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে।' সাথে সাথে তিনি দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও বলে দিলেন। এ ব্যাখ্যা বাদশাহের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ফলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ তুলে নেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

মন্ত্রী পদ লাভ

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর প্রচুর খাদ্যশস্য ফলন হয়। পরবর্তী সাত বছরে কম ফলন হওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর ভ্রাতারা তিনবার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য রাজদরবারে আসে। প্রথমবারেই হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে মানবিক কারণে প্রত্যেকবারই তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদর বিন ইয়ামিনকে আটকিয়ে রাখেন। তৃতীয়বার নিজের পরিচয় প্রদান করেন এবং পিতার-পরিবারের লোকজনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তখন ভ্রাতাগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে : "তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরাতো অপরাধী ছিলাম।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

হযরত ইউসুফ (আ.) এ বলে তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন যে, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

পরবর্তী সময়ে ভাইয়েরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। এরপর তাঁরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা হযরত ইউসুফ(আ.)-এর মতো বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। তার মতো চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করব এবং ক্ষমা করতে শিখব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কা নগরীতে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত ও দেশপ্রেম

হিজরত অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। হিজরতের আর একটি অর্থ রয়েছে শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। মক্কা নগরীতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘর অবরোধ করল। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে কাফিরদের এ সিদ্ধান্তের ও অবরোধের কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর কাছে রাখা আমানতের সম্পদগুলো হযরত আলি (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বিছানায় তাঁকে রেখে হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে করে প্রত্যুষে কাফিরদের চোখ এড়িয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। কাফিররা ঘরে প্রবেশ করে মহানবি (স.)-এর বিছানায় হযরত আলি (রা.)-কে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তবে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমানতদারী দেখে লজ্জিত হলো। যাকে শত্রু ভেবে হত্যার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা, তিনি এত মহান ও উদার হতে পারেন তা তারা চিন্তাও করেনি। মহানবি (স.) আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররাও তাঁদের খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পড়ল। আবু বকর (রা.) এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে বললেন, "তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সুরা-আত তাওবা, আয়াত ৪০) পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছলেন। মদিনার সর্বস্তরের লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল।

মক্কায় কাফিররা যতই নির্যাতন করল, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব নির্যাতন সহ্য করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করালেও প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নিজে কোথাও যাননি। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ আসল। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় মক্কাকে লক্ষ্য করে বললেন 'আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূমি। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' (তিরমিযি)

মদিনা সনদ

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে মদিনার সনদ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করে পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা সনদের ধারাসমূহ

সনদে মোট ৪৭টি (মতান্তরে ৫০টি) ধারা ছিল। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে।

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কারো উপর যদি বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তবে সকল সম্প্রদায় মিলে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।

৩. কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ গোপন চুক্তিও করতে পারবে না।

৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না।

৫. কেউ যদি কোনোরূপ অপরাধ করে, তবে তার জন্য তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। এজন্য তার সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা যাবে না।

৬. অসহায়, দুর্বল, অত্যাচারিতকে সর্বতোভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করতে হবে।

৭. হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদি কাজকর্ম এখন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো।

৮. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং তিনিই পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদের ফলে মদিনার লোকজনের মাঝে সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহের অবসান হলো। তারা ঐক্যবদ্ধ হলো। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্প্রীতি স্থাপিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ ইসলাম প্রসারের কাজ আরও বেগবান হলো। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গড়ে উঠল রাজনৈতিক ঐক্য এবং গোড়াপত্তন হলো একটি শান্তিময় ইসলামি রাষ্ট্রের।

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন

মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র। ফলে মুসলমানগণ বিনা বাধায় সকল ইসলামি বিধি-বিধান পালন করার সুযোগ পেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সুশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো-

ক. আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ধর্ম, বর্ণ গোত্রভেদে সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা।

গ. মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ঙ. মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন করা।

চ. ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর দূরদর্শিতা

জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অদম্য ইচ্ছা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মনে জাগ্রত হলো। অবশেষে ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের যিলকদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল ১৪০০ (চৌদ্দশত) নিরস্ত্র সাহাবি। তাঁদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যেকের সাথে ছিল মাত্র একটি করে কোষবদ্ধ তরবারি। তৎকালীন আরবে প্রত্যেক লোকের সাথেই এসব থাকত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে খুব ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদল বলে অস্ত্রসহ অগ্রসর হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট হযরত উসমানকে দূত হিসেবে পাঠালেন। কাফিরদেরকে বোঝানো হলো যে মুসলমানরা শুধু হজ করে আবার চলে যাবে। হযরত উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবিদের নিয়ে একটি গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং উসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। এ শপথ 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। মুসলমানদের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কাফিররা হযরত উসমানকে মুক্তি দিল। অনেক বাকবিতন্ডার পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে চুক্তি হলো। এ চুক্তি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির লেখক ছিলেন হযরত আলি (রা.)। চুক্তিতে অনেকগুলো শর্ত ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১. ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ হজ সমাপন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যেকোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩. আগামী বছর মুসলমানগণ হজ করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের অধিক সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। সেই তিন দিন কুরাইশগণ নগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।

৪. হজে আগমনকালে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।

৫. হজের সময় মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ থাকবে।

৬. মক্কার বণিকগণ মদিনার পথ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসায়–বাণিজ্য করতে পারবে।

৭. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পুরোপুরিভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির চুক্তিগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলো। তবে বাস্তবে সব শর্তই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। সন্ধির ফলে পরবর্তীতে বিনা বাধায় মক্কা বিজয়সহ মুসলমানদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠল।

বর্তমান মুসলিম জাতির উচিত মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে মদিনা সনদের আটটি ধারার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

পাঠ ৪

হযরত উসমান (রা.)

পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান, মাতার নাম ছিল ওরওয়াহ। ইসলামের চার খলিফার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় খলিফা। বাল্যকাল থেকেই তিনি নম্র, ভদ্র, লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে রাসুল (স.) তাঁর প্রথম কন্যা রুকাইয়াকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। রুকাইয়া মারা গেলে অতঃপর উম্মে কুলসুমকে তাঁর কাছে বিবাহ দেন। ফলে তাঁকে 'যুন্নুরাইন' (দুই নুরের অধিকারী) বলা হতো। তিনি ব্যবসা করতেন বিধায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাই তাঁকে 'গণি'(ধনী) বলা হতো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। তাঁর নিকটাত্মীয়রাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে থাকতেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার (মুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন।

খিলাফত লাভ ও কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সংকলনে হাত দেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিল। তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করে তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের সকল কপি সংগ্রহ করলেন। হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাঠান। অবশিষ্ট সংগৃহীত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংকলন করার ফলে তাঁকে 'জামেউল কুরআন' (কুরআন সংকলক) বলা হয়। হযরত উসমান (রা.) দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে রাসুল (স.) বলেছেন- 'প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু রয়েছে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবেন উসমান।'

হযরত উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনা

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামী খিলাফত ব্যাপক বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে বর্তমান পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তরে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত তা বিস্তার লাভ করে। তাঁর সময়ে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সম্প্রসারিত হয় এবং কল্যাণমূলক বহু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

তিনি অনেকগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পাদন করেন, যাতে করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হয়। তিনি হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ভাতা প্রায় ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, বাজার পরিদর্শক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক নিয়োগ করেন।

খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিনি নিজের জন্য কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। তাঁর প্রথম ৬ বছরের শাসন আমল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে হযরত উসমান সম্পর্কে লেখাটি পাঠ করে শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করবে।
বাড়ির কাজ : ইসলামের কল্যাণে হযরত উসমান (রা.)-এর অবদানসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৫

হযরত আলি (রা.)

পরিচয়

হযরত আলি (রা.) ছিলেন রাসুল (স.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি ছোটদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি ১০ বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শারার' (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি)-এর একজন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে সাথে থাকতেন। রাসুল (স.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। রাসুল (স.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে হযরত আলি (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত আলি (রা.) খুব নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের সময় তাঁকে তাঁর বিছানায় রেখে যান। রাসুল (স.)-এর কাছে আমানত রাখা সম্পদ মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরপরও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনা

হযরত আলি (রা.) ছিলেন একজন অসাধারণ বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কারণে বদরের যুদ্ধে 'জুলফিকার' নামক তরবারি উপহার পান। আর খায়বার যুদ্ধে 'কামুস' দুর্গ বিজয়ের পর রাসুল (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি দেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন।

জ্ঞান সাধক হযরত আলি (রা.) ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। কুরআনের তাফসির, হাদিসের বিশ্লেষণ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর, আর আলি (রা.) তার দরজা।" (মুস্তাদরাক হাকিম)। হযরত আলি (রা.)-এর রচিত 'দেওয়ানে আলি' (আলির কাব্য সংকলন) আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর শাসনামলে মসজিদে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেন।

খলিফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) শাহাদতবরণ করেন। এরপর মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে হযরত আলি (রা.) মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগুলো সমাধা করেন।

হযরত আলি (রা.)–এর রাষ্ট্র পরিচালনা

তখন মুসলমানগণ চরম উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসের চরম সংকটকাল চলছিল। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক জোট (Coalition) গঠন করেন এবং প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। তিনি অভিজাত ভূমি মালিকদের নিকট থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করেন এবং আদায়কৃত কর ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন প্রায় সকল মুসলমানই বেদুঈন ও কৃষক ছিলেন সে কারণে তিনি ভূমি ও কৃষি উন্নয়নের বিষয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

হযরত আলি (রা.)-এর প্রশাসনিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে মিসরের গভর্নর মালিক আল-আশতারের কাছে প্রেরিত নির্দেশনামূলক একটি চিঠিতে, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তুমি তোমার প্রজাদের জন্য তোমার অন্তকরণে ক্ষমা, ভালবাসা ও দয়া প্রবিষ্ট কর। তাদেরকে সহজে শিকারযোগ্য মনে করে তাদের সম্মুখে পেটুক জন্তুর মতো হয়ো না। কেননা তারা দুইধরনের : হয়তো তারা তোমার ধর্মীয় ভাই নয়তো তারা সৃষ্টিগতভাবে তোমার সমান। তারা অসতর্কভাবে ভুল করতে পারে, তাদের অদক্ষতা থাকতে পারে, তাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশত (মন্দকাজ) সংঘঠিত হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে সেভাবেই ক্ষমা কর যেভাবে তুমি আল্লাহর কাছে তার ক্ষমা প্রত্যাশা কর। কেননা, তুমি তাদের উপরে এবং যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে সে তোমার উপরে, আর আল্লাহ তার উপরে যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে।

তুমি তাদের (প্রজাদের) চাহিদাগুলো পূরণ করবে আল্লাহ তাই প্রত্যাশা করেন এবং তিনি তাদের দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করছেন।"

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত নির্দেশনাকে ইতিহাসে ইসলামি শাসনের আদর্শ সংবিধান (Ideal Constitution of Islamic Governance) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জীবনযাপন

হযরত আলি (রা.) ছিলেন সহজ-সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করতেন। কখনো কখনো অনাহারে থাকতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তিনি প্রায় ৬ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক এক পথভ্রষ্ট খারেজির হাতে শাহাদতবরণ করেন। তখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। রাসুল (স.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- 'সে [আলি (রা.)] প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু।' (তিরমিযি)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনায় হযরত আলি (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৬

হযরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হযরত ফাতিমা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তিনি নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না ও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী।

তিনি যাহরা (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাবন্যাময়ী) ও বাতুল (পবিত্র, সংসারে অনাসক্ত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর হিজরি দ্বিতীয় সনে হযরত আলি ইবনু আবু তালিবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দেন মোহর ছিল ৪৮০ - ৫০০ দিরহাম (মুদ্রা)।

সরল জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা (রা.) খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্বামী হযরত আলি (রা.) দরিদ্র হলেও তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। হযরত আলি (রা.) পরিশ্রম করে যা অর্জন করতেন তা দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। কখনো কখনো অনাহারে- অর্ধাহারে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। তিনি ত্যাগ স্বীকার করতেন কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাতেন না। এমনকি তাঁর চেহারায়ও কষ্টের কোনো ছাপ দেখা যেত না। তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। তাঁর কোনো চাকরানী ছিল না। জাঁতা পিষা ও বালতি দিয়ে পানি উঠানোর ফলে তার হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেত। তিনি সবসময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলতেন।

দানশীলতা

হযরত ফাতিমা (রা.) দানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। দান করার সময় তিনি যে অভাবী তা বোঝা যেত না। খালি হাতে কেউ তাঁর নিকট থেকে ফেরত যেত না। বর্ণিত আছে, একদা তিনি খাবারের লোকমা মুখে তুলছিলেন, এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে বলল, 'হে নবি কন্যা! আমাকে ভিক্ষা দিন। গত তিন দিন যাবৎ আমি অনাহারে আছি।' তিনি তাঁর খাবারটুকু ভিক্ষুককে দিতে পুত্র হাসানকে নির্দেশ দিলেন। এতে হাসান (রা.) আপত্তি জানিয়ে বললেন, আম্মা! গতকাল হতে আপনি কিছুই খাননি। আপনি এ খাবার খেয়ে নিন। উত্তরে তিনি পুত্র হাসানকে বললেন, 'এটা ভুল হবে। আমি মাত্র একদিন অভুক্ত আছি, আর এ ফকির তিন দিন ধরে কোনো কিছু খায়নি।'

পিতৃভক্তি

ছোটবেলা হতে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর পিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-কে ডাকলেন, কানে কানে কী যেন বললেন, সাথে সাথে হযরত ফাতিমা (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুনরায় মহানবি (স.) তাঁকে কাছে ডেকে কী যেন বললেন, তাতে তিনি হাসতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হাসি-কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আব্বাজান প্রথমে আমাকে জানিয়েছেন 'মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব'। আর দ্বিতীয়বার আমাকে জানিয়েছেন, 'পরিবারের সকলের মধ্যে আমিই তাঁর [মুহাম্মদ (স.)] সাথে প্রথমে মিলিত হবো।' হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন কখনো মুচকি হাসি হাসেননি।

স্বভাব – চরিত্র

হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকল গুণই অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীল, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর অধিক আস্থাশীল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, 'ফাতিমা আমার দেহের এক অংশ, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।' (বুখারি)

তিনি আরও বলেন, 'ফাতিমা হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী।'(বুখারি)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি ফাতিমার তুলনায় স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র।'(আল-ইস্তি'য়াব)

সন্তান-সন্ততি

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসাইন (রা.), হযরত মুহসিন (রা.), হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ও হযরত যয়নব (রা.)। হযরত মুহসিন (রা.) বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্তিকাল

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (রা.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এগারো হিজরির তৃতীয় রমযান মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। হযরত ফাতিমা (রা.)-কে

জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। সুন্দর চরিত্র, পিতৃভক্তি, অকৃত্রিম স্বামী সেবা, দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিশ্ব নারী জাতির ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

দলগত কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাইয়ের নাম কী ?

ক. ইসমাঈল (আ.) খ. বিন ইয়ামিন (আ.)

গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (র) ঘ. ইউনুছ (আ.)

২. হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানির জন্য আল্লাহর নির্দেশ ছিল –

i. পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

ii. পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

iii. কুরবানি ওয়াজিব করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবাসী জালাল মিয়া উদার হস্তে দান করেন এবং এলাকায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এতে এলাকার মোড়ল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদল দুষ্কৃতিকারী লেলিয়ে দেয় এবং তারা তাকে অপমানিত করে। তারপরও জালাল মিয়া নিরুৎসাহিত না হয়ে তার জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন।

৩. জালাল মিয়ার কাজে মূলত কোন খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খ. হযরত উমর (রা.)-এর

গ. হযরত উসমান (রা.)-এর ঘ. হযরত আলি (রা.)-এর

৪. জালাল মিয়ার কাজের ফলে –

i. আল্লাহ খুশী হন

ii. সমাজ উপকৃত হয়

iii. নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমঝোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। চুক্তি সম্পাদনের পর সেলিম মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বলেন, মহানবী (স:) এর জীবনী অনুসরণ করেই আমরা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

(ক) হযরত ইসমাঈল (আ:) এর উপাধি কী ছিল?

(খ) মহানবী (স:) মদিনায় হিজরত করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের সমঝোতা চুক্তিটি মহানবী (স:) এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। প্রাচুর্য আর ধন-সম্পদ জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করেনি, বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মারামারি বেঁধে গেলে জাহিদ সাহেব স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের সহযোগিতায় বিষয়টি মীমাংসা করেন এবং গ্রামবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, সমাজে আমরা সবাই ভাই ভাই হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। এজন্য সবার প্রতি ক্ষমা, ভালবাসা ও দয়াশীল হতে হবে।

(ক) হযরত ফাতিমা (রা:) কী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন?

(খ) হযরত ইউসুফ (আ:) তাঁর ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) জাহিদ সাহেবের সর্বশেষ উক্তিটি কোন খলিফার উক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত